এই সময়
কথা স রি ৎ

যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম।
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৌশল

দেশব্যাপী 'লকডাউন' তার মধ্যবিন্দুতে। আক্রান্তের সংখ্যাও দ্রুত হারে ক্রমবর্ধমান। তার প্রথম কারণটি যদি হয় তবলিঘি জামাত সূত্রে সংক্রমিত গোষ্ঠী, দ্বিতীয়টি সংক্রমণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর উদ্যোগ। মূলত কিছু রাজ্যে সংক্রমণের হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তার মধ্যে প্রধান মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাড়ু ও দিল্লি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, প্রত্যেকটি রাজ্যও নগরায়নের নিরিখে সারা দেশে অগ্রগামী। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্র, যে রাজ্যে এক দিনেই ১৪৫টি নতুন সংক্রমণের ঘটনা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। বস্তুত এই রাজ্যের রাজধানী মুম্বই, যা ভারতের বাণিজ্যিক কেন্দ্রও বটে, কী ভাবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশব্যাপী লড়াইয়ের সূচিমুখ। কারণ, তার জনবসতির ঘনত্ব। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতানুযায়ী, কোভিড-১৯ মহামারীর ব্যাপ্তির চরিত্র অনেকটাই তার পূর্বসূরী এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সমতুল্য, কারণ এটি ভৌগোলিক নিরিখে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। শহরের যে এলাকাগুলিতে জনঘনত্ব বেশি, সেই সব এলাকাতেই দ্রুত সংক্রমণের সম্ভাবনা অধিকতর। সেই কারণেই মহারাষ্ট্র সরকার এমন কিছু অঞ্চল চিহ্নিত করেছে, যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা গেলে সংক্রমণের ব্যাপ্তি অনেকটাই আটকে রাখা যায়।

দেশের অন্যান্য শহরাঞ্চলকেও একই কৌশল গ্রহণ করতে হবে। অধুনা মুম্বইতে যদি কোনও ব্যক্তি সংক্রমিত হয়, তা হলে সেই ব্যক্তির থেকে শারীরিক দূরত্ব এবং জনঘনত্বের নিরিখে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাটিকে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা শহরের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কঠোরতর। অবশ্যই শহরের নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী পদ্ধতিটিতে কিছু রদবদল হতেই পারে, কিন্তু মৌলিক নীতিটি একই থাকার সম্ভাবনা। বিশেষত উল্লেখযোগ্য মুম্বইয়ের ধারাভি, যা এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি হিসেবে সুপরিচিত, এবং যেখানে জনবসতির ঘনত্ব মুম্বইয়ের শহরের মধ্যেও সর্বোচ্চ। সেখানে ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯-এ একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই রকম ভৌগোলিক অঞ্চলে যত দ্রুত সংক্রমণের সম্ভাবনা কমবে, সারা দেশে করোনা-যুদ্ধে জয়ের আশা ততই উজ্জ্বল হবে। মনে রাখা দরকার, ভারতের শহরগুলি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্তব্ধ করলে আখেরে ক্ষতির মাত্রাই বাড়বে। কাজেই ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সংক্রমণকে সীমিত রাখা ছাড়া নান্যপন্থা।

অসচেতন

কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ রোধ করতে গেলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই একমাত্র পথ বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাদের নির্দেশ মেনেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতেও আরম্ভ হয়েছে লকডাউন পদ্ধতি। রোগটি অতীব সংক্রামক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় এর কিছু ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে এবং সেই কারণে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও উদ্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি একটি গ্রামে কোয়ারান্টিন সেন্টার তৈরি নিয়ে উদ্ভূত এক ঘটনায় প্রাণহানিও হয়েছে। খবরে প্রকাশ, বীরভূমের পাড়ুই গ্রামে কোয়ারান্টিন সেন্টারের জন্য

বিদায় হোক ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, গণচর্চায় ফিরুক আমজনতার জীবন-জীবিকা, বিজ্ঞান আন্দোলন

ধর্মগুরু নয়, শিরোধার্য ডাক্তার-বিজ্ঞানীদের কথা

করোনাভাইরাস মহামারী রুখতে অপরিহার্য সমাজের বিজ্ঞানসচেতনতা। এবং এই সংকটে বিপর্যস্ত মানুষের স্বার্থে প্রয়োজন অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

এএনআই

দিল্লিতে তবলিগ-ই-জামাতের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, এমন কিছু ব্যক্তির স্বাস্থ্যপরীক্ষায় রত চিকিৎসকেরা

করোনা-সংকট নিয়ে বিশেষ কিছু বলার মতো বিশেষজ্ঞ না হবার ফলে চুপচাপ বাড়িতে বসে কাজ করছিলাম। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও অর্থশাস্ত্রীদের মতামত টেলিভিশনে শুনছিলাম ও সংবাদপত্রে পড়ছিলাম। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দাবি অনুযায়ী, এখনই দরকার অন্তত সাত লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ যা ভারতকে করোনা-সংকট মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। সেই তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ কিছুই না। এই চর্চাও সামনে এসেছে যে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কেন আগাম সতর্কীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরকারি পদক্ষেপ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করে নেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী মতকে জায়গা না দিয়ে করোনা-সংকটে শাসকের ভূমিকায়

কালবেলা

#করোনাভাইরাস

পরিত্রাতা হবার ভেক ধরা হচ্ছে।

এর মধ্যে দুটো খবর চোখে পড়ল। দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকার তবলিগ জামাতের মারকাজ পরিচালিত ধর্মীয় সমাবেশ ও ২ এপ্রিল বেশ কিছু রাজ্যে রামনবমী উপলক্ষে কিছু মন্দিরের সামনে ভিড়। দেশে যখন মারাত্মক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লকডাউন চলছে, তখন পুলিশ থেকে প্রশাসন কারওর কথা শুনল না ধর্মীয় উন্মাদনায় মেতে ওঠা কিছু মানুষ।

তবলিগ জামাতের প্রবাদপ্রতিম মৌলানা জাকারিয়ার 'ফাজায়েলে আমল' এর একটি মূল শিক্ষা হল অন্যের সঙ্গে খারাপ ও অভব্য ব্যবহার না করা। তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে ইসলাম ধর্মের মৌলিক রীতির প্রচার করে থাকেন, যেমন ইমান (ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস), নমাজ (দিনে পাঁচবার প্রার্থনা), রোজা (রমজান মাসে উপোস), জাকাত (সামর্থ থাকলে গরিবদের মধ্যে দান-খয়রাত) আর হজ (সামর্থ থাকলে মক্কায় পুন্যতীর্থ)। ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে যাঁদের কোরান-হাদিসের ন্যূনতম জ্ঞান আছে, তারাও জানেন এমন কিছু কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যা নির্দোষ মানুষের জন্য পীড়াদায়ক হতে পারে। আর এক্ষেত্রে তো ভাইরাস ছড়িয়ে মৃত্যুঘণ্টা পর্যন্ত বাজিয়ে দেবার একটা পরিস্থিতি হতে পারে। কিন্তু সে সব ধর্মীয় বাণীর কি কোনও আমল দিলেন তবলিঘিরা? উল্টোদিকে রাম নবমী পালন করতে গিয়ে এখনও পর্যন্ত কত মানুষের মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে সেই হিসেব কে করছে কে জানে?

এবার আসা যাক ধর্মীয় বাবাজি-মাতাজী বা বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতিষী-পিরদের ডেরায়। সেখানে এখনও কত ভিড় হচ্ছে বা সেখানে বিভিন্ন ভক্তকুলের মধ্যে দূরত্ব রাখা হচ্ছে কি না তার খবর আর কে রাখে? করোনা-সংকটের সময় বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বাড়াবার প্রয়োজন। থালা বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো, মোমবাতি জ্বালানো, পুজো-প্রার্থনা ইত্যাদি করার সময় নয়। কেউ যদি উক্ত কাণ্ড-কারখানায় নিমগ্ন থাকতে চান, কারণ তিনি যুক্তির থেকে ভক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেন, তা হলে বাড়ির ভিতরে বসে করুন। ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে রাখুন।

পাবলিক করে ধর্ম করলে আপনি যে বিধাতাকেই স্মরণ করুন না কেন, তিনি যে বেশি সাড়া দেবেন বা পৃথিবীজুড়ে সমস্ত মহামারীর অবসান হয়ে যাবে তা একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সময়ে অচল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুদের, বিজ্ঞানীদের, জন-স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের কথা শুনতে হবে। না হলে আপনিও অকালে মরতে পারেন আর অন্যের সুস্থ জীবনকে অযথা অসুস্থ করতে পারেন। করোনা-সংকট তা চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে।

করোনা সংকট থেকে দুটো বড় ইস্যু সামনে আসছে। এক বৈজ্ঞানিক সচেতনতা আর দুই অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন। এই দু'টি বিষয় ভারতে নিকট অতীতের পাবলিক ডিসকোর্সের মধ্যে ক্রমাগত পিছনের সারিতে ছিল। তুলনায় গত ছ'বছরে ধর্মকেন্দ্রিক ইস্যু (ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে গণপিটুনিতে খুন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মোড়কের ছাপ) এবং অর্থনৈতিক গিমিক (বিমুদ্রাকরণ এবং যথার্থ পরিকল্পনাহীন জিএসটি) রাজনৈতিক-সামাজিক পরিধির মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে। এই সবের মধ্যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আয় এবং কর্মসংস্থান নিয়ে কিন্তু তেমন সিরিয়াস নীতি প্রবর্তন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সময় দেয়নি। তাই পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন বলতে কেবল স্থূল অর্থে সরকারি অনুদান নয়।

আয় এবং কর্মসংস্থান, পুনর্বণ্টনমূলক নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু ধর্মীয় বাবাজি-মাতাজীরা থাকতে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক রাজনীতি যারা করে, যথা আমাদের দেশে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন থেকে শুরু করে জামাত-এ-ইসলামি বা মুত্তাহিদা-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন থাকতে কি বৈজ্ঞানিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টনের প্রশ্নগুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হবে? আজ যদি তা বিচার করা না হয়, তা হলে সেটা 'নিজের পায়ে কুড়ুল মারা' বলা হবে না। তাকে বলতে হবে, 'কুড়ুল খুঁজে বের করে তার উপর নিজের পা মারা'। ঘরে বসে সবসময় লেখা-পড়া করা যায় না। মানসিক আর শারীরিক কসরতের পাশে কিছু ভালো ছবি দেখা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান সচেতনতার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের কয়েকটি চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন 'মহাপুরুষ' (১৯৬৫) ছবিতে ভণ্ড বাবাজির বুজরুকি ধরে ফেলছেন বিজ্ঞান সচেতন এবং দাবাড়ু একদল যুবক। ভণ্ড বাবাজির মুখোশ খুলে দেওয়া হচ্ছে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'(১৯৭৮)-এ। 'গণশত্রু' (১৯৮৯) ছবিতে দেখানো হচ্ছে কী ভাবে নর্দমার জল মন্দিরের চরণামৃতকে দূষিত করে জীবিত মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তপন সিংহর 'এক ডক্টর কি মউত' (১৯৯০) বিজ্ঞানচেতনাকে আরও একটি উন্নত ধাপের দিকে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। অন্য দিকে। ১৯৪৩ সালে, বাংলার দুর্ভিক্ষের যে করুণ অবস্থা 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩) ছবিতে উদ্ভাসিত হয়েছে বা সেই সংকটকালের স্মৃতিকে মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮০) ছবিটি তুলে ধরেছে যেখানে শহর এবং গ্রামের সম্পর্ক আর তার সঙ্গে জড়িত চাহিদা-জোগানের টানাপোড়েনে থাকা বাজার এবং পুনর্বণ্টনের প্রসঙ্গ আজকের করোনা-সংকট কালে প্রাসঙ্গিক। ওই ঐতিহাসিক ছবিগুলো থেকে আজকের পরিস্থিতে তে কী করা যায়, আর কী করা যায় না তা শেখার আছে।

বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক দূরত্বের আবহে আজ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের নিত্যদিনের গার্হস্থ্য-কার্যের সহায়ক গৃহকর্মীরা অনেকে স্বাভাবিক কারণে ছুটি নিয়েছেন বা তাঁদেরকে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষ মনে মনে হয়তো 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' (১৯৭৭) ছবির মীর রোশান আলির মতো বলছে 'চাকরদের ছাড়া আমরা কী রকম অসহায় হয়ে পড়ি'। গৃহকর্মী ছাড়া আমাদের দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে বিপুল মানুষ আছেন, তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যতটা করছে, তা অনেক কম। সরোজ দে-র 'কোনি' ছবিতে ক্ষিতীশ সিংহ ওরফে ক্ষিদ্দা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং পেশাদারিত্বের উচ্চতম মাপকাঠিকে সামনে রেখে সাঁতার শেখাচ্ছেন কোনি নামক একটি বস্তিবাসিনীকে যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষানবিশের কঠোর পরিশ্রম এবং বেঁচে থাকার লড়াই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে লড়াই করে টিকে থাকার মেলবন্ধনে একটি সফলতার কাহিনি হল কোনি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ অথবা জগজ্জননীর কৃপায় প্রতিযোগিতা জেতার টোটকা কিন্তু ক্ষিদ্দা দিচ্ছেন না। এ ছাড়া আরও অনেক গুণী মানুষের ছবি হয়তো বাংলায় বিজ্ঞানচেতনা এবং রাজনৈতিক-অর্থনীতির পাঠ পড়াতে পারে সাধারণের জন্য, কারণ অসাধারণ বইপত্র বা গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ সাধারণের সাকুল্যের বাইরে।

অন্য দিকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী এমন একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন যাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বচ্ছ। গত তিন দশকে এক দিকে বিজ্ঞান আন্দোলন ক্রমশ শক্তিহীন হয়েছে, আর অন্য দিকে বিজ্ঞানচর্চা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্রে সীমিত থেকেছে। সাধারণের সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার যে একটি ক্ষেত্র ছিল তা ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন কুসংস্কার ও বুজরুকির ফাঁদে পড়ছেন। করোনার মতো সংকট কিংবা ভবিষ্যতে আরও নতুন কোনও মহামারীর মোকাবিলা করতে বিজ্ঞানচেতনা বাড়াবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যেখানে বহু মানুষ একই ঘরে গুঁতোগুঁতি করে থাকেন, সেখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থালা বাজানো একটি চরম রসিকতা। আর থালা বাজিয়ে তো থালায় খাবার জুটবে না।

ভূতেদের দিন শেষ। গুপী গাইন, বাঘা বাইনের মতো ভূতের রাজা এসে থালায় খাবার দিয়ে যাবে না। বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। সেই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ উন্নত মানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান চেতনার উপরে নির্ভরশীল। তাই ধর্মে মনোযোগ একটু কম দিয়ে কর্মে মনোযোগ দিলে ভাল হয় না? পাবলিক কি শুনছেন?

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

ক রো না ফা ই ল ২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মায়ের সঙ্গে কি সদ্যোজাত সন্তানকে রাখা নিরাপদ? করোনা আক্রান্ত মায়ের সঙ্গেই সদ্যোজাতকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। জানানো হয়েছে, রোগাক্রান্ত মায়ের স্তন্যপানও করবে নবজাতক। তবে, চিন ও আমেরিকা কোভিড-১৯ সংক্রমিত মায়ের থেকে সন্তানকে দূরে রাখার পক্ষপাতী। চিনে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ৭৩১ জন গর্ভবতীর মধ্যে মাত্র একুশ জনের সন্তানের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল। উহানের তেত্রিশ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত মায়ের জন্ম দেওয়া তিনটি মাত্র সদ্যোজাতের শরীরে মিলেছিল নভেলকরোনা। ছ' দিনের মাথায় তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। স্তন্যপান করছিল শিশুগুলি।

সংকলন মৃন্ময় চন্দ